মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে সম্প্রীতির বাংলাদেশ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
বিজয়ের পঞ্চাশ বছর
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শুভেচ্ছা

নবপর্যায় : ২য় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২২

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট ডিকসন বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন ব্যতিক্রমীভাবে

২০ নভেম্বর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে উদ্বোধন ঘটে "বৃটেন ১৯৭১ : বাংলাদেশের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি" শীর্ষক প্রদর্শনীর। মুক্তিযুদ্ধকালে বৃটেনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সারস্বত সমাজ এবং প্রবাসী বাঙালিরা যে ব্যপক সংহতি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তার পরিচয়বহ আলোকচিত্র ও দলিলপত্র নিয়ে এই প্রদর্শনী শুরু হয়। প্রদর্শনী ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট ডিকসন-এর বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করে। স্বাধীনতার ৫০ বছরে তিনি সকলকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানান। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের এই শুভেচ্ছা বক্তব্য হাই কমিশনের নিজস্ব দপ্তরের পরিবর্তে এবার ধারণ করা হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অস্থায়ী প্রদর্শশালায়। জাদুঘর গ্যালারিতে ধারণকৃত শুভেচ্ছা বক্তব্যের ভিডিও দেখার জন্য লিংক :
https://fb.watch/a18pDkrV9C/

শুভেচ্ছা বার্তা

Profound ties of culture, history and people connect the UK and Bangladesh. In August 1971 thousands from across the UK marched for Bangladesh in Trafalgar square. That same year Bengali Students from Cardiff begun a 72 hour hunger strike in front of the House of Commons. A group from London, called Operation Omega, risked arrest and imprisonment to deliver humanitarian aid to the Bangladeshi people. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman delivered his first press conference after liberation from Claridges Hotel in London before returning as leader of an independent Bangladesh. This are just a few of the events that laid the foundations of Brit-Bangla Bondhon. Today, in Bangladesh's 50th year of victory, I invite you to look to the next 50 years of our relationship. An era that will be marked by strong ties in trade, diplomacy, security, culture and education. A true 21st century partnership.
সবাইকে বিজয় দিবসের অনেক শুভেচ্ছা।

মুক্তির পথে গণতান্ত্রিক রায় ও শপথ

৩ জানুয়ারি ১৯৭১ : বঙ্গবন্ধুর অনন্য নেতৃত্ব

১৯৭১-এর ৩ জানুয়ারি রমনার রেসকোর্স ময়দানে শপথ গ্রহণ করেছিলেন ৭০-এর নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী আওয়ামী লীগের ১৫১ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং ২৬৮ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। শপথ বাক্য পাঠ করান বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের দাবী থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত পথ পরিক্রমায় একাত্তরের তিন জানুয়ারির শপথ অনুষ্ঠানটির রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। এই বিশেষ দিনটি স্মরণ করে ৩ জানুয়ারি ২০২২ অনুষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ আয়োজন 'মুক্তির পথে গণতান্ত্রিক রায় ও শপথ : বঙ্গবন্ধুর অনন্য নেতৃত্ব'। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১৯৭০ সালের নির্বাচিত জণপ্রতিনিধি ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রণেতা ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৭০-এর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ইলিয়াস চৌধুরীর পুত্র, বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী এমপি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর কন্যা সিমিন হোসেন রিমি এমপি। দিনটির তাৎপর্য ব্যখ্যা করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধিকার আদায়ের যে আন্দোলন তার চূড়ান্ত পর্যায় ছিল সত্তরের এই সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচন ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের প্রথম এবং শেষ সাধারণ নির্বাচন। ৩ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের বিশেষত্ব ছিল জনতার সামনে বঙ্গবন্ধু জনপ্রতিনিধিদের শপথ পাঠ করিয়েছিলেন কারণ তাঁদের জবাবদিহিতা ছিল জনগণের কাছে। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে *৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বিশেষ প্রদর্শনী

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন : সুবর্ণ-জয়ন্তী' শিরোনামে এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ১৪ই জানুয়ারি শুরু হওয়া মাসব্যাপী এই প্রদর্শনী ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত চলবে। সোম থেকে শনিবার সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এ প্রদর্শনী সকলের জন্য উম্মুক্ত থাকবে।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের লবিতে আয়োজিত এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন কৃষি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী এমপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিবছর আড়ম্বরপূর্ণভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন করে। কিন্তু করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সমগ্র পৃথিবী যেখানে স্থবির হয়ে আছে সেখানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধ ও

বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালবাসা ও দায়বদ্ধতা থেকে সীমিত পরিসরে হলেও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সেই জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমাদের অন্তরের সংবেদনশীল জায়গায় মুক্তিযুদ্ধের নাম লেখা। তিনি বলেন, এ প্রজন্মের মানুষেরা হয়তো অনেক কিছু পেয়েছে বা ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু পাবে কিন্তু তারা মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারবে না। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার গৌরব এনে দিয়েছে। কিছু কোলাবেরেটরস ছাড়া ৩০ লক্ষ শহীদের বাইরে প্রতিটি পরিবারেই *৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

বছর শুরু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্রের মিলনমেলায়

বছরের প্রথম দিনে বিকেল থেকেই একটি উৎসব মুখর আমেজে ভরে উঠে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রাঙ্গণ। উৎসবের আয়োজক, অংশগ্রহণকারী, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা এবং সেচ্ছাসেবকদের প্রাণোচ্ছ্বাস উপস্থিতি এক মিলনমেলায় রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাদের প্রিয় স্থান হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণ, একবছর পর সশরীরে এখানে উপস্থিত হতে পেরে সবার মধ্যেই ছিল উচ্ছ্বাসের জোয়ার।

বিশ্বের মুক্তি ও মানবাধিকার নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত "মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব "লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ"-এর নবম আসর করোনা মহামারির কারণে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২১ সালের ৮ থেকে ১২ জুন। গত ১ জানুয়ারি ২০২২, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয় নবম লিবারেশন ডকফেস্ট উৎসবে অংশ গ্রহণকারী সকল স্বেচ্ছাসেবক, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং প্রামাণ্যচিত্র কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে সম্মিলনী অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক নিজামূল কবীর। আরো উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ। উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর একে একে এবারের সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার, নির্মাতা, ইয়ুথ জুরি ও স্বেচ্ছাসেবকদের সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক নিজামূল কবীর প্রামাণ্যচিত্র সংরক্ষণ ও নির্মাণে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন এবং প্রামাণ্যচিত্র কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি, তার বক্তব্যে এই সুন্দর উদ্যোগে তরুণদের অংশগ্রহণকে অনুপ্রাণিত করেন এবং গ্রহণকারী সকল স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক তার বক্তব্যের শুরুতেই প্রায়াত ট্রাস্টিদের কথা স্মরণ করেন। উৎসবটি আন্তর্জাতিকভাবে যে সাড়া ফেলেছে তা তুলে ধরেন। উৎসবে অংশগ্রহণকারী প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা, সেচ্ছাসেবক, প্রিভিউ কমিটির সদস্য, জুরি এবং ইয়ুথ জুরিসহ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পুরস্কার প্রাপ্ত সেরা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাদের হাতে স্মারক তুলে দেন।

জাতীয় পর্যায়ে সেরা প্রামাণ্যচিত্রের পুরস্কার লাভ করে Why not প্রামাণ্যচিত্র। পরিচালক শেখ আল মামুন দেশের বাইরে থাকায় তার পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন প্রামাণ্যচিত্রটির প্রযোজক সাইফুল জার্নাল। শেখ আল মামুন ভিডিও বার্তায় তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠান শেষে Why not প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

জুবাইরিয়া আফরোজ বিনতি

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী শতদিনের উৎসব

স্কুল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

বাঙালির জীবনে একাত্তর একই সাথে সর্বোচ্চ আনন্দ এবং প্রাপ্তির বছর অন্যদিকে সর্বোচ্চ ত্যাগ আর বেদনার বছর। একাত্তরের ১ জানুয়ারি থেকে ১০ এপ্রিল ছিল ঘটনা বহুল সময়। সত্তরের নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠনের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল একাত্তরের জানুয়ারি মাস এবং ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনির অতর্কিত আক্রমণ এবং গণহত্যা শুরুর পর ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ রূপ পায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে একাত্তরের শুরুর শতদিন স্মরণে উৎসব উদযাপনের আয়োজন করে। উদযাপনের সূচনা ঘটে ১ জানুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্রের মিলনমেলার মধ্য দিয়ে। উৎসবের আবহ নিয়ে উদযাপন শুরু হলেও কিছুটা বিঘ্ন ঘটে আবারো করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায়। স্বাস্থ্য-সুরক্ষাবিধি মেনে, কিছুটা সীমিত করতে হয়েছে আয়োজনের পরিসর। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যে কোন আয়োজনের কেন্দ্রে থাকে নবীন শিক্ষার্থীরা, তাই শতদিনের উৎসবকে কেন্দ্র করেও জাদুঘর মুখরিত হচ্ছে শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে। এই আয়োজনে ৪ জানুয়ারি উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থীর ব্যান্ড বাদনের সাথে আরেকদল শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রতিকী ইটে ছবি এঁকে মুক্তিযুদ্ধের দেয়াল তৈরি করে। ৬-৭ জানুয়ারি ছিল স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য এক মিনিট ফিল্ম নির্মাণ কর্মশালা। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মুক্তমঞ্চে নিয়মিত থাকছে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় নৃত্যানুষ্ঠান। ইতোমধ্যে ৫ জানুয়ারি কল্যাণপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রীরা, ১০ জানুয়ারি আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ১২ জানুয়ারি ভাষানটেক স্কুল এন্ড কলেজ ও ১৩ জানুয়ারি আলী হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্তি

১৯৯৬ এর মার্চ, বাংলাদেশ যখন উদযাপন করছিল স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী, তখন বাংলাদেশের স্বাধীন হয়ে ওঠার ইতিহাস ধারণ করে ৫, সেগুনবাগিচায় দ্বার উন্মোচিত হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের। ২০২১-এ বাংলাদেশ যখন পালন করছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী তখন ব্যক্তিউদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘর পৌঁছে গেছে ২৫-এর কোঠায়, শুরুতে শংকা ছিল অর্থায়নের, শংকা ছিল স্মারক পাওয়া নিয়ে। সর্বসাধারণের আনুকূল্যে সেই শংকা দূর হয়ে এই জাদুঘর পরিণত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ স্মারক ও দলিলের সর্ববৃহৎ সংগ্রহশালায়, আগারগাঁওয়ে সুবৃহৎ পরিসরে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন যে জাদুঘর ভবন স্থাপিত হয়েছে তার নির্মাণ ব্যয়ের একটি বড় অংশ বহন করেছে জনগণ। ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা একটি প্রতিষ্ঠানের জনগণের প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার পেছনে থাকে অনেক শ্রম, ত্যাগ আর ভালোবাসার গল্প। দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়ে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান যখন সর্বোচ্চ শ্রম দিয়ে নতুন প্রজন্মকে তার গর্বের আর বেদনার ইতিহাস বলতে ব্রতী হয়, যখন সচেষ্ট হয় নতুন প্রজন্মকে ইতিহাসের আলোয় ভবিষ্যতের মানুষ হিসেবে তৈরি করতে, তখন রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি থেকে শুরু করে স্কুল শিক্ষার্থীও হয়ে ওঠে তার চলার পথের সাথী। ২৫ পূর্ণ করা জনগণের এই প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বিজয়ের মাসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভূষিত করলো বিশেষ সম্মাননায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে এই সম্মাননা গ্রহণ করেছেন ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের, ডা. সারওয়ার আলী ও মফিদুল হক। দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, চ্যানেল আই, মহাকাল নাট্যসম্প্রদায় ও বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে সম্মানিত করায় তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ও নিরপেক্ষ ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণে এবং তাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে গড়ে তোলার ব্রতে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবার দৃঢ় প্রত্যয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রত্যাশা করে বরাবরের মতোন ভবিষ্যতেও সকলে এই প্রতিষ্ঠানকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেবেন।

জল্লাদখানা স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে বিজয়ের পঞ্চাশ বছর উদযাপন

‘মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে সম্প্রীতির বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্য ঘিরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক পরিচালিত মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে ১৪, ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর আয়োজন করা হয় ৩ দিনব্যাপী বিজয় উৎসব-২০২১। ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। স্মৃতিচারণ করেন শহীদ বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক খন্দকার আবু তালেব-এর পুত্র খন্দকার আবুল আহসান। আরও উপস্থিত ছিলেন জল্লাদখানায় শহীদদের সন্তান ও শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতেই অংশগ্রহণ করে জল্লাদখানায় শহীদদের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের সন্তানদের নিয়ে সংগঠন ‘বধ্যভূমির সন্তানদল’। তারা পরিবেশন করে ‘সত্য-সাম্য-শান্তির জয়’ নামক গীতি-নৃত্য-আলেখ্যানুষ্ঠান। পর্যায়ক্রমে ওয়াইডব্লিউসিএ ফ্রী স্কুল, বার্ডো, মিথস্ক্রিয়া আবৃত্তি পরিসর ও মুকুল ফৌজ মিরপুর ৬নং শাখা মুক্তিযুদ্ধ ও দেশাত্ববোধক গান, কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। সবশেষে ম আ সালাম রচিত ও স্বপন দাস নির্দেশিত পথনাটক ‘কমান্ডার’ পরিবেশন করে দৃষ্টিপাত নাট্য সংসদ।

১৫ ডিসেম্বর, বুধবার বিজয় উৎসবের দ্বিতীয় দিনে স্মৃতিচারণ করেন শহীদ মো: আব্দুল হাকিম-এর পুত্র মো: আব্দুল হামিদ ও শহীদ আক্রব আলীর পুত্র মো: ফরিদুজ্জামান। পরবর্তীতে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ঢাকা-১৬ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্ ও ৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক। স্বপ্নবীণা শিল্পকলা বিদ্যালয়ের ছোট্ট শিশুশিল্পী বন্ধুদের কণ্ঠে এই পদ্মা এই মেঘনা, মুক্তির মন্দির সোপান তলে, গেরিলা গেরিলা আমরা গেরিলা প্রভৃতি গান ও কবিতা পরিবেশনা দিয়ে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পর্যায়ক্রমে ঝিনুক শিশু-কিশোর সংঘ, শহীদ খন্দকার আবু তালেব উচ্চ বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত শিল্প-সংস্কৃতি কেন্দ্র দেশাত্মবোধক, গণজাগরণমূলক ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান পরিবেশন করে। আনন্দলোক সাংস্কৃতিক একাডেমি ও মম কালচারাল একাডেমির নৃত্য পরিবেশনা ছিল মনোমুগ্ধকর। শহিদুল শ্যানন রচিত ও কাজী দেলোয়ার হেমন্ত নির্দেশিত অবয়ব নাট্যদল পরিবেশিত ‘কাকতাড়ুয়া’ পথনাটকের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হয়।

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরে রাত ১২.০১ মিনিটে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণের শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক, মিরপুর শহীদ পরিবার কল্যাণ সমিতি ও মিরপুরের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।

জল্লাদখানা প্রাঙ্গণে বিকেল ৪টায় শুরু হয় মহান বিজয় দিবসের আয়োজন। প্রতি বছরের তুলনায় এবারের আনন্দ ছিল অনেক বেশি। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বিজয়ের পঞ্চাশ বছরপূর্তি উপলক্ষে সহস্রাধিক দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিই ছিল তার প্রমাণ। মহান বিজয় দিবসে স্মৃতিচারণ করেন শহীদ বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক খন্দকার আবু তালেব-এর কন্যা সখিনা খন্দকার ও শহীদ আক্রব আলীর পুত্র মো: ফরিদুজ্জামান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে চারুলতা একাডেমির শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করে আবৃত্তি অনুষ্ঠান ‘বায়ান্ন থেকে একাত্তর’। ঢাকা সিটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিজয় দিবসের ইতিহাস নির্ভর বক্তব্য প্রদান করে। গণজাগরণমূলক গান, কবিতা ও নৃত্য পরিবেশন করে বধ্যভূমির সন্তানদল। ‘সংগীত সমাজ কল্যাণপুর’ পরিবেশন করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান ও গণসংগীত। বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টস ও যুব বান্ধব কেন্দ্র (বাপসা) এর চমৎকার নৃত্য পরিবেশনা বিজয় আনন্দকে আরো কয়েকগুন বাড়িয়ে তোলে। মুহাম্মদ শাহনেওয়াজ অপূর্ব রচিত ও নির্দেশিত পথ নাটক ‘আলুপোড়া’ এবং সগীর মোস্তফা রচিত ও আনিসুর রহমান সেলিম নির্দেশিত, সাত্ত্বিক নাট্য সম্প্রদায় পরিবেশিত ‘রাজার চোখ বন্ধ, রাজার চোখ অন্ধ’ পথ নাটকের মধ্য দিয়ে বিজয় উৎসব-২০২১ এর সমাপ্তি ঘটে।

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

Education and Memory in times of a Global Crisis

Presentation of Memorial sites and current education projects from Bangladesh to Poland

বিগত দুটি বছর করোনা অতিমারির প্রকোপে বিশ্বজুড়ে জীবন-জীবিকা যেমন থমকে গেছে, তেমন বিঘ্নিত হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতিচর্চা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন বন্ধ থেকেছে তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাদুঘরগুলোও দরজা বন্ধ করেছে বারবার। জাদুঘর তো কেবল পুরোনো স্মৃতির সংগ্রহশালা নয়, বরং অতীতকে ঘিরে ভবিষ্যতকে আলোকিত করার প্রক্রিয়া। জাদুঘর বন্ধ হলে সেই আলোকায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তবে একটি পথ বন্ধ হলে চলে বিকল্প নানা পথ তৈরির প্রয়াস। বৈশ্বিক সংকটময় পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের জাদুঘর এবং মেমোরিয়াল সাইট তাদের কর্মকাণ্ড সচল রাখার পথ হিসেবে খুঁজে পায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অনলাইন প্লাটফর্মকে। সৃষ্টি হয় নতুন কর্মযজ্ঞের। নানা দেশের জাদুঘর এবং মেমোরিয়াল সাইটগুলোর সেই কর্মযজ্ঞের সাথে পরিচিত হতে এবং একে অন্যকে সমৃদ্ধ করতে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ জার্মানির Dachau Concentration camp Memorial Site, Dachau আয়োজন করে Education and Memory in times of a global crisis শিরোনামের কর্মশালা। এই কর্মশালায় জার্মানি এবং পোল্যান্ডের পাশাপাশি বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক। পোল্যান্ডের Treblinka Museum প্রতিনিধি Paweł Maliszewski এবং আয়োজক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে Maximilian Lütgens নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। ট্রাস্টি মফিদুল হক তুলে ধরেন করোনা পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ঘুরে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা। অভাবিত ও অভূতপূর্ব এই সংকট বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ করে দিয়েছে। তবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দ্রুতই নতুন পরিস্থিতি মোকাবেলায় উদ্ভাবনী উপায়ে নিজেদের সক্রিয়তা বজায় রাখা ও মানুষের কাছে পৌঁছবার ব্যবস্থা নেয়। এই কাজে বড় সহায় হয় অনলাইন তথা ডিজিটাল মাধ্যম। সংকটময় পরিস্থিতিতে একের পর এক ডিজিটাল ও অনলাইন প্রোগ্রাম গ্রহণ করে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, দেশের এবং দেশের বাইরের মানুষের সঙ্গে গড়ে তুলছে নতুন সংযোগ, তৈরি হচ্ছে নতুন সম্ভাবনা। ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর Office of the UN Special Advisor Prevention of Genocide -এর সহায়তায় শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর পাঠ-উপকরণ তৈরি করছে। নতুন শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিজিটাল পাঠ-উপকরণ তৈরির কাজ করছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এতে অংশ নিচ্ছেন শিক্ষক প্রতিনিধি ও ডিজিটাল উপকরণ নির্মাণ বিশেষজ্ঞরা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নানা কার্যক্রম বিশ্লেষণে বলাই যায়, জাদুঘরের দরজা বন্ধ হলেও তারা খুলে দিয়েছে একের পর এক জানালা।

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঘুরে এলো চা-এর শহর মৌলভীবাজার জেলা

মহান বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসন আয়োজিত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ থেকে ৭ জানুয়ারি, ২০২২ 'বিজয় উৎসব' অনুষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী সময়ে মৌলভীবাজার জেলায় শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এবারে চা-এর শহর মৌলভীবাজার জেলায় ২০০৬ ও ২০১৬ সালের পর জানুয়ারি, ২০২২ মাসে সংক্ষিপ্তভাবে শিক্ষা কর্মসূচি সদরসহ তিন উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন সময়ে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক ও শিক্ষা), জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাবরীনা ইয়াসমিন বাধন, নেটওর্য়াক শিক্ষক মাধুরী মজুমদার ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ শ্যামলী চন্দ প্রমুখ আন্তরিকতার সহিত সহযোগিতা করেন। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ বিকাল চারটায় সিলেট বিভাগীয় কমিশনার ড. মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে 'বিজয় উৎসব'-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনীর সূচনা করেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের ইতিহাস এখনও কিছুটা বিদ্যমান এ জেলায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় মৌলভীবাজার জেলা ৪নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল এবং মেজর চিত্ত রঞ্জন দত্ত সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। ৪ নম্বর সেক্টরকে ৬টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয় সাব-সেক্টরসমূহ– জালালপুর, কৈলাশহর, কমলপুর, আমলাসিদ, কুকিতল ও বড়পুঞ্জি। মার্চ মাসের শুরু থেকে পাকিস্তানি বাহিনী শমসেরনগর বিমান বন্দর ব্যবহার করত এবং পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন গোলাম রসুল শমসেরনগর বিমান বন্দরে ঘাঁটি গেড়ে অবস্থান নেন। ৭ মার্চের পর মুক্তিপাগল জনতা জেলার নানা প্রান্তে প্রতিরোধ গড়ে তোলে যাতে পাকিস্তানি বাহিনী জেলা শহরে প্রবেশ করতে না পারে। ২৩ মার্চ মুক্তিপাগল গৌরাপদ দেব কানু মৌলভীবাজার মহকুমায় প্রথম পাকিস্তানি পতাকায় অগ্নিসংযোগ করেন। ২৬ মার্চের পর থেকে গৌরাপদ দেবকে ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে পাকিস্তানি বাহিনী। অবশেষে ২৮ মার্চ গৌরাপদ দেব পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং ৩১ মার্চ নির্মমভাবে তাকে হত্যা করা হয়। এ জেলায় প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধটি হয় শমসেরনগর রেলওয়ে স্টেশনে ২৭ মার্চ বেলা আড়াইটা দিকে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে জনতার গুলিতে একজন পাকিস্তানি অফিসার নিহত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি বাহিনী টিকতে না পেরে পালিয়ে যায়। ২৭ মার্চের পর থেকে প্রায় একমাস মৌলভীবাজার জেলা শত্রুমুক্ত ছিল। পুনরায় শক্তি বৃদ্ধি করে ২৮ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী মৌলভীবাজার শহর দখলে নিয়ে পিটিআই, সার্কিট হাউস, সড়ক ও জনপথ ডাক বাংলো ও মৌলভীবাজার আনসার ফিল্ড (বর্তমানে জেলা প্রশাসক কার্যালয়) এ অবস্থান নেয়। পাকিস্তানি বাহিনী শহরে প্রবেশের পর স্থানীয় মুসলীম লীগ, পিডিপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতারা আনুগত্য প্রকাশ করে। তাদের কাজের সহযোগিতার জন্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে মিছির আলীকে আহ্বায়ক করে মহকুমা শান্তি-কমিটি গঠন করে। পাকিস্তানি বাহিনী রাজনগর থানার আজমল আলী, শ্রীমঙ্গল থানার দেওয়ান আব্দুর রশিদ এবং কমলগঞ্জ থানার অব্দুল বারী বিটিকে আহ্বায়ক করে থানা শান্তি-কমিটি গঠন করে। উল্ল্যেখ যে কমলগঞ্জ থানা শান্তি-কমিটির সদর দপ্তর ছিল শমসেরনগরে। মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা ইতিহাসের পাশাপাশি রয়েছে অসংখ্য নির্যাতনের স্মৃতি চিহ্ন। অনেক নির্যাতনের স্মৃতি চিহ্নের মধ্যে কিছু সংরক্ষিত আছে আর অনেকগুলো বিলিনের পথে। উল্লেখ্য বধ্যভূমিগুলো– মনু সেতু বধ্যভূমি, পিটিআই, বড়বাড়ি, শমসেরনগর বিমান বন্দর, সিন্দুরখান জয়বাংলা, ওয়ারলেস রেস্ট হাউস, সাধুবাবার গাছথলা, পদ্মদিঘীর পাড়।

উল্লেখ্য গণহত্যাগুলো- মনু ব্রীজ, রামকৃষ্ণ মিশন, মৌলভী চা বাগান, কামালপুর, নরিয়া, শেরপুর জেটি, পিটিআই, শমসেরনগর বিমান বন্দর, ভাড়াউড়া চা বাগান, সিন্দুরখান জয় বাংলা, ওয়াপদা রেস্ট হাউস, রাজঘাট

চা বাগান, সাধুবাবার গাছথলা, পাঁচগাঁও, চাটুরা ব্রিজ, লোহাইউনি চা বাগান, হলিছড়া চা বাগান, পঞ্চেশ্বর।

উল্ল্যেখযোগ্য যুদ্ধ– ২৭ মার্চ শমসেরনগর প্রতিরোধ যুদ্ধ, কালেঙ্গা যুদ্ধ, শেরপুর যুদ্ধ (কুশিয়ারা নদীর পাড়ে অবস্থান নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তিনদিক থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থানের উপর আক্রমণ করে। শেরপুর যুদ্ধে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়)। এ জেলার বৃহৎ গণকবর বলতে পাঁচগাঁও গণকবর, এখানে একসাথে ৬৯ জনকে হত্যা করে কবর দেয়া হয়। উল্লেখ্য বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে বৃহৎ বধ্যভূমি শমসেরনগর বিমান বন্দর ও সাধুবাবার গাছথলা (শ্রীমঙ্গল বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন)। উভয় বধ্যভূমিতে শহীদদের স্মরণে স্মৃতি ফলক নির্মিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ মৌলভীবাজার জেলা স্কুলে রক্ষিত মাইন বিস্ফোরণে শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। এ জেলায় মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত ১১ জন বীরাঙ্গনা বীর নারীর কথা জানা যায়। ৮ ডিসেম্বর মৌলভীবাজার জেলা হানাদার মুক্ত হয়।

মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসন আয়োজিত 'বিজয় উৎসব' অনুষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনীর সময়ে দেখা যায় সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি তেমন গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করছে না। এখানকার জনগণের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মান পশ্চাৎমুখি এবং মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি তারা তেমন গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছেনা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনী সময়ে গণকবর, বধ্যভূমি ও যুদ্ধস্থান বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অন্য শিক্ষকদের কাছে জানার চেষ্টা করলে তারা তেমন কোন তথ্য দিতে পারে না। এ জেলায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তির চেয়ে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ছদ্মবেশে অনেক সক্রিয়।

এ জেলা পরিক্রমণ সময়ে নেটওয়ার্ক শিক্ষক মাধুরী মজুমদার জানান– বঙ্গবন্ধু মৌলভীবাজারে প্রথম আসেন ১৯৬৯ সালে, তারপর ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রচারণায় এবং ১৯৭৩ সালে স্বাধীনতার পর। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে সারা দেশে পরিভ্রমণের এক পর্যায়ে মহকুমা শহর মৌলভীবাজারে আসেন। সেদিনের সফরে তার সাথে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, কামরুজ্জামান, আব্দুল মমিন তালুকদার ও দেওয়ান ফরিদ গাজী। বঙ্গবন্ধু ওয়াপদা রেস্ট হাউসে সফরসঙ্গী সবাইকে নিয়ে অবস্থান করেন। ১৯৬৯ সালের আগমনের মূল আয়োজক ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রধান সংগঠক মীর্জা আজিজ আহমদ। বিকেলে বঙ্গবন্ধু স্থানীয় জিন্নাহ হলে মতবিনিময় সভায় যোগ দেন। আরো জানা যায় ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু শ্রীমঙ্গলে গণসংযোগ করেন। শ্রীমঙ্গলে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিত থাকার কথা ছিল বেলা দুইটায় কিন্তু তিনি এসেছিলেন রাত তিনটার সময়। সেদিন রাতে বঙ্গবন্ধু ডা. আব্দুল আলীর বাসায় উঠেছিলেন এবং তার সাথে সফরসঙ্গী হিসাবে তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন। শ্রীমঙ্গলে স্থানীয় নেতাদের মধ্যে ইলিয়াস আলী, আলতাফুর রহমান ও আব্দুল মতলিবসহ অনেকে উপস্থিত ছিলে। বঙ্গবন্ধু আবার ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রচারণায় শ্রীমঙ্গল আসেন এবং শ্রীমঙ্গল পৌরসভা মাঠে জনসভায় যোগদান করেন।

পরিসংখ্যান : 'বিজয় উৎসব' অনুষ্ঠানে অবস্থান সময়ে যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে– আজমনি বহু পাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদ্রাসা, কদমহাটা উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীমঙ্গল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার জামেয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, খালিশপুর রহমানিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা, আপ্তাব উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও আজাদ বখ্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ। এ জেলায় ০৭ দিনে ০৬ কার্য দিবসে ০৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ০১টি কামিল মাদ্রাসা, ০১টি আলিম মাদ্রাসা ও ০১টি দাখিল মাদ্রাসার ৬৯১৮জন শিক্ষার্থী ও ০৬টি উন্মুক্ত প্রদর্শনীতে ১২৯০০ জন সাধারণ দর্শক ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শনী দেখেন।

রঞ্জন কুমার সিংহ, কর্মসূচি কর্মকর্তা

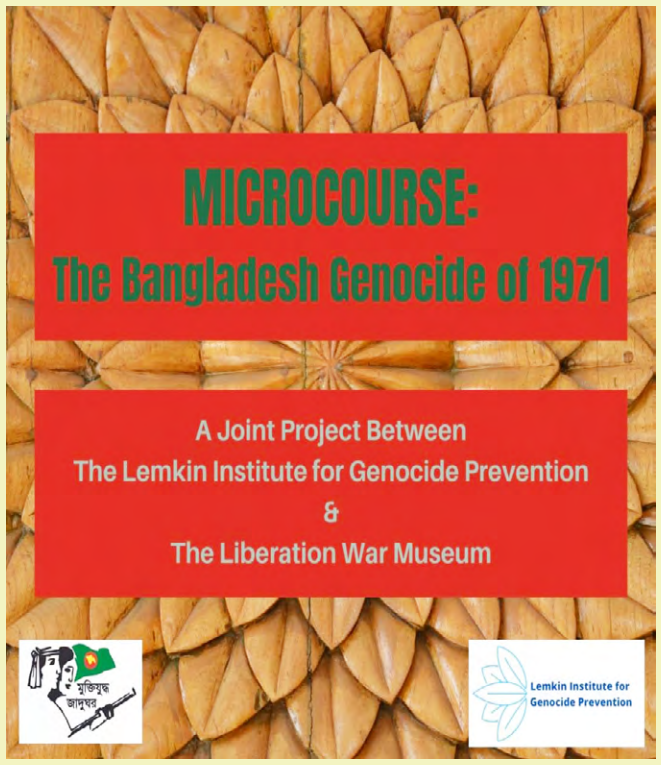

বাংলাদেশ গণহত্যা : ১৯৭১
৬ দিনের মাইক্রো কোর্স অনুষ্ঠিত

বিজয় দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে সুবর্ণ জয়ন্তীর জন্য অভিনন্দন জানায় লেমকিন ইনস্টিটিউট, ইরাক প্রজেক্ট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন-আইপিজি।

স্মারক অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে এবং তরুণ প্রজন্মকে বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে জানানোর উদ্দেশ্যে লেমকিন ইনস্টিটিউট এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে গত ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৬ দিনের মাইক্রো-কোর্স পরিচালনা করে।

এই মাইক্রো কোর্সের আলোচ্য বিষয়সমূহ ছিল যথাক্রমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সংগ্রাম, শরণার্থী সংকট, যৌন সহিংসতার শিকার, বুদ্ধিজীবী হত্যা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল- বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট এবং সবশেষে বাংলাদেশের গণহত্যা থেকে শিক্ষা।

যৌথ এই প্রয়াসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন সেন্টার ফর দ্যা স্টাডিস অফ জেনোসাই এন্ড জাস্টিসের কো অর্ডিনেটর নওরিন রহিম, সেন্টারের ইন্টার্ন তাবাসসুম নুহা, মোহাম্মদ ইকরা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সেন্টারের পরিচালক মফিদুল হক।

তাবাসসুম নুহা

প্রদর্শনী ‘‘মানবিক নীতি। এখানে এবং এখন’’

(হিউম্যানটেরিয়ান প্রিন্সিপাল. হিয়ার অ্যান্ড নাউ)

আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ৫ম তলার অস্থায়ী গ্যালারিতে ‘‘মানবিক নীতি। এখানে এবং এখন’’ শিরোনামে মাসব্যাপী প্রদর্শনী শুরু হতে যাচ্ছে। প্রদর্শনীটি যৌথভাবে আয়োজন করেছে সুইস ফেডারেল ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্যা রেড ক্রস (আইসিআরসি), ফটো এলিসি, লুসানে এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকা।

বিশ্বজুড়ে মানবিক সংকট প্রতিদিনই খবরের শিরোনাম হচ্ছে। এই ট্র্যাজেডিগুলোর সাথে সম্পর্কিত চিত্রগুলো প্রায়শই অশ্রু, যন্ত্রণা, ক্ষুধা, হতাশা, একাকীত্ব, বিচ্ছেদ, জনশূন্যতা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। কখনো কখনো আমরা সংকট, সহিংসতা, সশস্ত্র সংঘাত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই সমস্ত চিত্রগুলোর দ্বারা অসহায় বা অভিভূত বোধকরি। এই সমসাময়িক বিষয়ে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হল শিল্পের মাধ্যমে দর্শকদের মননশীল সম্পৃক্ততা বাড়ানো/ প্রচার করা। দর্শকদের চিন্তা-ভাবনার ব্যাখ্যা প্রণয়ন এবং মানবিক নীতি ও দৈনন্দিন জীবনে এর প্রয়োগ প্রতিফলিত করতে নিজেদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি নজর দিতে উৎসাহিত করা।

উদ্বোধনের পর প্রদর্শনীটি রবিবার ব্যতীত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২, সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

আর্কাইভ ও ডিসপ্লে টিম

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক, শহীদজায়া, একাত্তরের ঘাতক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক বেগম মুশতারী শফী গত ২০ ডিসেম্বর ২০২১ প্রয়াত হন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যাত্রা শুরুর সময় যারা স্মারক প্রদান করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীরভাবে শোকাহত

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

জহির রায়হান

কালজয়ী কথা-সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান ১৯ আগষ্ট ১৯৩৫ সালে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

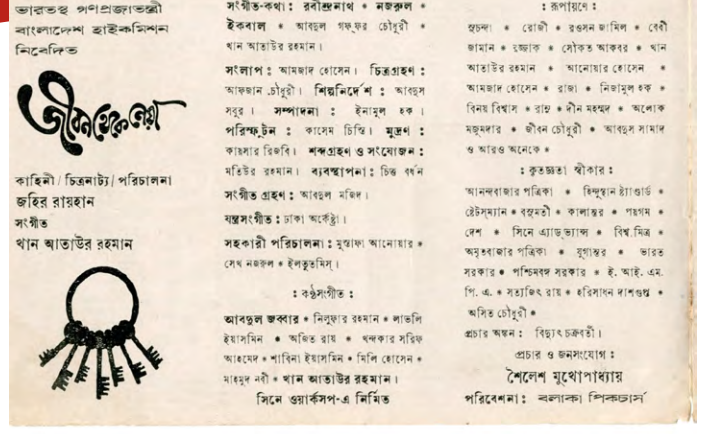

১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বাংলায় বি.এ (অনার্স) সম্পন্ন করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার কারণে কারাবরণ করেন। মুক্তিলাভের পর ফটোগ্রাফি শেখার জন্য কলকাতায় প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল ফটোগ্রাফি স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে জহির রায়হান চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৬১ সালে মুক্তি পায় তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র ‘কখনো আসেনি’। এরপর একে একে ‘সোনার কাজল’, ‘সংগম’, ‘কাঁচের দেয়াল’, ‘বেহুলা’, ‘জীবন থেকে নেয়া’, ‘আনোয়ারা’, ‘বাহানা’, ‘জ্বলতে সুরুজ কে নীচে’ ইত্যাদি। ইংরেজি চলচ্চিত্র ‘লেট দেয়ার বি লাইট’-এর কাজ শেষ না হতেই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধে যোগ দেন তিনি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার নির্মমতা এবং বাঙালির মুক্তির আকুতি তুলে ধরে কলকাতায় বসে তৈরি করেন প্রামাণ্য চিত্র *‘স্টপ জেনোসাইড’*। তাছাড়া ভাষা আন্দোলনের ওপর নির্মিত তাঁর চলচ্চিত্র ‘জীবন থেকে নেয়া’র বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী কলকাতায় হয়। প্রদর্শনী থেকে পাওয়া পুরো অর্থ তিনি মুক্তিযুদ্ধের তহবিলে প্রদান করেন। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গড়ে তোলেন বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেনশিয়া সংগঠন।

জহির রায়হান ১৯৬৪ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমি কর্তৃক মরনোত্তর সাহিত্য পুরস্কার (উপন্যাস), ১৯৭৭ সালে শিল্পকলায় (চলচ্চিত্রে) অবদানের জন্য মরণোত্তর একুশে পদক এবং ১৯৯২ সালে সাহিত্যে অবদানের জন্য মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।

স্বাধীনতার পর পরই জহির রায়হান ঢাকায় এসে শুনতে পান অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার এবং দেশের আরো অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মর্মান্তিক হত্যা ও নিখোঁজ হওয়ার কথা। শহীদুল্লাহ কায়সারের নিখোঁজ হওয়ার খবরে তিনি মর্মাহত হন এবং তাঁরই চেষ্টায় তদন্ত কমিটি গঠিত এবং তদন্ত কাজ শুরু হয়। ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ঘাপটি মেরে থাকা স্বাধীনতার শত্রুদের অবস্থান জেনে অগ্রজকে খুঁজতে ঢাকার মীরপুরে গিয়ে নিখোঁজ হন মৃত্যুহীন প্রাণ জহির রায়হান।

লালমনিরহাট জেলার কিছু স্মৃতিময় স্থান

ওয়ারলেস কলোনি বধ্যভূমি : লালমনিরহাট শহরে মুক্তিযুদ্ধের সময় সবচেয়ে বড় গণহত্যা সংঘটিত হয় লালমনিরহাট রেলওয়ে স্টেশন এলাকায়। মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস এ অঞ্চলের আশেপাশে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনী লালমনিরহাট শহর দখল নেয়ার পর ৫ এপ্রিল সকালে বিহারিদের সহযোগিতায় সাহেব পাড়া বাবুপাড়া ও অনান্য স্থান থেকে সাধারণ মানুষ, রেলওয়ে কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিকদের ধরে নিয়ে এসে রেলওয়ে ট্রলি স্ট্যান্ডে জড়ো করে। নিরীহ লোকদের হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেয় পাকিস্তানি মেজর সামুন্দার খান এবং সহযোগিতা করে বিহারি নেতা কামরুদ্দিন, আজগর, কালুয়া গুণ্ডা, কসাই আব্দুর রশীদসহ প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে লালমনিরহাটে একদিনে এক স্থানে ও এক সঙ্গে নিরীহ তিনশতাধিক বাঙালিকে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ড শেষে পাকিস্তানি বাহিনী চলে যাবার পর রেল বিভাগের সুইপার দিয়ে রেলওয়ে বিভাগীয় ম্যানেজার অফিস সংলগ্ন ডোবায় লাশগুলো ফেলে মাটি চাপা দেয়। ওয়ারলেস কলোনি বধ্যভূমিটি লালমনিরহাট জেলার বৃহৎ বধ্যভূমি। ওয়ারলেস কলোনি বধ্যভূমি দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে তবে কোন স্মৃতি ফলক নেই।

রেলওয়ে হাসপাতাল গণহত্যা : ৪ এপ্রিল ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনী শহরে প্রবেশ করে এবং হাসপাতালে গিয়ে গণহত্যা চালায়। পাকিস্তানি বাহিনী হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগী, রেলওয়ে হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. আব্দুর রহমান ও তাঁর দুই পুত্র এবং ওসি মীর মোশারফসহ প্রায় ৪০ জন লোককে হত্যা করে। রেলওয়ে হাসপাতালের চারপাশে ১৯৭১-এর এই গণহত্যার কোন স্মৃতি চিহ্ন নেই।

রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাব : এই ক্লাবঘরটি মুক্তিযুদ্ধের সময় নাচঘর বলে পরিচিতি ছিল। ক্লাবটি ছিল ব্রিটিশ রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য বিনোদনের স্থান। বিহারি এবং রাজাকারের সহায়তায় আশপাশের নিরীহ সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে আসা হতো এই ক্লাবঘরটিতে। নরপশু পাকিস্তানি সৈন্যরা সুন্দরী নারীদের পাশবিক নির্যাতন চালাত। বর্তমানে নাচঘরটি রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবঘর বলে পরিচিত।

মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি : মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি বললে প্রথমেই বলতে হয় ডা. আব্দুল আজিজ-এর কথা। এই বন্ধুটি পরিচয় করিয়ে দেন সাংবাদিক ডেইলি স্টারের লালমনিরহাট জেলা প্রতিনিধি এস দিলীপ রায়ের সাথে এবং দাদার কাছ থেকে জানতে পারি কালীগঞ্জ থানার চন্দ্রপুর গ্রামের ইজ্জত আলী মাস্টার ও মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি। ইজ্জত আলী মাস্টার মুক্তিযুদ্ধের সময় চন্দ্রপুর গ্রামের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় চন্দ্রপুর গ্রামটি সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় শতশত শরণার্থীর ঢল নামে, সেই সকল শরণার্থীদের আশ্রয় দিতেন আর তার স্ত্রী ভাত রান্না করে খাওয়াতেন এবং পরে তিনি নিজে শরণার্থীদের নিয়ে সীমান্তের ওপারে ভারতে পৌঁছে দিতেন। এদিকে কালীগঞ্জ থানা পাকিস্তানি বাহিনী দখলে নিলে কিছু দিনের জন্য ইজ্জত আলী মাস্টারের বাগান বাড়িতে পালিয়ে বাঙালি পুলিশ অফিসার অস্থায়ী থানাও স্থাপন করেন। এছাড়া শরণার্থীদের মধ্য থেকে তরুণ ছেলেদের উদ্বুদ্ধ করে নিজের বাড়িতে যুদ্ধের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিতেন। পরবর্তীতে উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে সিদলকুচি ক্যাম্পে পৌঁছে দিতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আব্দুল, শুকুর, বেণু ও কিসমত ডাকাতের নারী নির্যাতন এবং বাড়িঘর লুটপাটের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে ইজ্জত আলী মাস্টার এপ্রিল মাসের শেষ অথবা মে মাসের প্রথম দিকে ভারতের সিদলকুচি বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সহযোগিতার আবেদন করেন। তিনি নিজে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে থেকে আব্দুল, কিসমত, শুকুর ও বেণু ডাকাতদের বাড়ি চিনিয়ে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেন। সিদুলকুচি ক্যাম্প থেকে আগত কোম্পানি কমান্ডার মো. মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধার দল ইজ্জত আলী মাস্টারের বাড়িতে অবস্থান নিয়ে এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। ইজ্জত আলী মাস্টারের স্ত্রীও মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথ মাস্টারের দায়িত্ব পালন করতেন কেননা উনার বাড়িতে অস্ত্র ও গোলা বারুদ মওজুদ রাখা হত। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য তিনি ভারতের সিদুলকুচি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের জন্য গিয়েছিলেন কিন্তু স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা এলাকায় সহযোগিতার জন্য তাকে অনুরোধ জানালে তিনি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে চন্দ্রপুর নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। ভোটমারী রেলওয়ে স্টেশন যুদ্ধে কোম্পানি কমান্ডার মো. মনিরুজ্জামানের সাথে সশরীরে অংশ নিয়ে যুদ্ধ করেন ইজ্জত আলী মাস্টার। আজ ইজ্জত আলী মাস্টার নেই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরেও চন্দ্রপুরের ইজ্জত আলী মাস্টারের সেই বাড়িটি একাত্তরের স্মৃতি বহন করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

মোঘলহাট তামাক গোডাউন : ৪ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী লালমনিরহাট শহরে প্রবেশ করে। জুলাই মাসের শেষ কী আগস্ট মাসের শুরুর দিকে পাকিস্তানি বাহিনী রাজাকারের সহায়তায় জেলা সদরের সন্নিকটে অবস্থিত মোঘলহাট বাজার আক্রমণ করে। বাজারে প্রবেশ করে তামাক কিনতে হাটে আসা বিভিন্ন এলাকার নিরীহ প্রায় ৫০ জন লোককে ধরে তামাক গোডাউনের ভিতরে হত্যা করে লাশগুলোকে আড়তে ফেলে রাখে। দেশ স্বাধীনের পর আড়ত থেকে অনেক কংকাল উদ্ধার করে গোডাউনের নিকটে রেল লাইনের পাশে মাটিচাপা দেয়া হয়। বর্তমানে সেই জায়গায় টেম্পো স্ট্যান্ড গড়ে উঠেছে এবং মাটিচাপা দেয়ার স্থানটি সংরক্ষণ না করায় বর্তমানে বোঝার কোন উপায় নেই।

কালীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় বধ্যভূমি : মুক্তিযুদ্ধের সময় কালীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে এদেশীয় দোসর রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনারা ক্যাম্প স্থাপন করে। রাজাকার বাহিনী দিনের বেলায় আশেপাশের গ্রাম থেকে নিরীহ লোকদের ধরে ক্যাম্পে নিয়ে আসতেন এবং নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে বিদ্যালয়ের পাশে কিছু লাশ মাটিচাপা দেয়া হত, বাকি লাশগুলো স্টেশনের পাশে অবস্থিত কুয়ার ভিতরে ফেলে দিত। বিদ্যালয়ের ভিতরে অবস্থিত বধ্যভূমিটি আজও চিহ্নিত করা হয়নি। বর্তমানে বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে কালীগঞ্জ করিম উদ্দিন (মুক্তিযুদ্ধের সময় কালীগঞ্জ থানার সংগঠক) পাইলট পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়।

তুষভাণ্ডার কুয়া বধ্যভূমি : লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার তুষভাণ্ডার রেলওয়ে স্টেশনের পিছনে প্রায়

২০০ গজ দূরে মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি কুয়া ছিল। এলাকার সাধারণ মানুষ এই কুয়ার পানি ব্যবহার করতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশীয় দোসর রাজাকার বাহিনী নিরীহ লোকদের হত্যা করে কুয়ায় ফেলে দিত। এক সময় এটি বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে কুয়াটির সন্নিকটে একটি কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে এবং কুয়াটি ভরাট করে ঐ জায়গায় গোলবেদী নির্মাণ করে বেদীর ভিতরে গাছ লাগিয়ে বধ্যভূমির চিহ্নটি মুছে ফেলা হয়েছে।

বুড়িমারী হাসর উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় : মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই বিদ্যালয় সীমান্ত সংলগ্ন পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারীতে অবস্থিত। ১৯৭১-এ মুক্তবাংলায় বুড়িমারী হাসর উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে অবস্থিত ক্যাম্পটি ৬ নং সেক্টরের সদর দপ্তর হিসাবে পরিচিত পায়। সেক্টর প্রধান বুড়িমারী হাসর উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগার ভবনটিতে সদর দপ্তরের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তৎকালীন প্রধান শিক্ষক মো. জয়নাল আবেদীনের বাস ভবনে এম কে বাশারের থাকার ব্যবস্থা করে তিনি অন্যের বাড়ীতে অবস্থান নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত ১১টি সেক্টরের মধ্যে একমাত্র ৬ নং সেক্টরটি বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে মুক্ত এলাকায় অবস্থিত ছিল। আজ ৫০ বছর পরে স্মৃতি বিজড়িত প্রধান শিক্ষকের সেই বাসভবন ও দাপ্তরিক (বিজ্ঞানাগার) ভবন ভেঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠদানের প্রয়োজনে নতুন দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এখন মুক্তিযুদ্ধের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু বলতে পুরাতন টিনসেড ভবন যেগুলোতে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান করতেন। হয়তো কোন এক সময় বিলীন হয়ে যাবে বুড়িমারী হাসর উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে অবস্থিত ৬ নং সেক্টর সদর দফতরের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকুও।

বড়খাতা রেলওয়ে স্টেশন : বড়খাতা রেলওয়ে স্টেশনটি হাতীবান্ধা উপজেলায় অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় বড়খাতা রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে। জুলাই মাসের শেষ দিকে লে. ফারুক শেখের নেতৃত্বে প্রায় ১২০ জনের মুক্তিযোদ্ধার দল বাউরা থেকে এসে বড়খাতা ক্যাম্প আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধার দল বড়খাতা রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি আসতে পাকিস্তানি বাহিনী গুলি চালাতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা গুলি চালান এবং কিছু সময় গোলাগুলির পর মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে। এখনও বড়খাতা রেলওয়ে স্টেশনের পুরাতন টিনসেড ভবনটি ১৯৭১-এর যুদ্ধের অসংখ্য গুলির ক্ষতচিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তিস্তা রেলওয়ে স্টেশন জাম গাছ : জেলা সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তিস্তা রেলওয়ে জংশন। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে নির্বাচনি প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু কুড়িগ্রাম থেকে বিশেষ ট্রেন যোগে লালমনিরহাট জেলায় যাবার পথে তিস্তা রেলওয়ে জংশনে পথসভায় যোগ দেন। পথসভাটি অনুষ্ঠিত হয় তিস্তা রেলওয়ে জংশনের পূর্ব পাশে জাম গাছ তলায় এবং পথসভার মঞ্চ নির্মাণ করা হয় মাছের বাক্স দিয়ে। বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে স্টেশনের যে জাম গাছ তলায় পথসভা করেছিলেন সেই জাম গাছটি ১৯৮৮ সালে ভেঙ্গে গেলে স্থানীয় পান বিক্রেতা ইফতার আলী বঙ্গবন্ধুর পদচারণার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য সেই জায়গায় আরেকটি জাম গাছ রোপন করেন। বর্তমানে স্মৃতি বিজড়িত জামগাছ তলায় গড়ে উঠেছে খাবার হোটেল ও ইফতার আলীর পানের দোকান।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণার্থীরা ২৭ ডিসেম্বর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কিউরেটর, আর্কাইভ ও ডিসপ্লে আমেনা খাতুন তাদের স্মারক সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানান

পল্লী কর্মসংস্থান ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষাণার্থীরা ৫ জানুয়ারি ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য এখন থেকে এ প্রতিষ্ঠান নিয়মিত তাদের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করাবেন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৮০ জন শিক্ষার্থী ৮ জানুয়ারি ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে। শিক্ষার্থীদেরকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন সেন্টারের কর্মী হাসান মাহমুদ অয়ন

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২৪০জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের নিয়মিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ১১ ও ১২ জানুয়ারি ২০২২ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

মুক্তির পথে গণতান্ত্রিক রায়

১ম পৃষ্ঠার পর

পাওয়া জনগণের রায় পশ্চিম পাকিস্তান অস্বীকার করায় মুক্তিযুদ্ধকালে বিশ্বজনমত বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ শপথ গ্রহণ করেছিলেন ব্যরিস্টার আমীর-উল ইসলাম, পরবর্তীতে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেন তিনি। ব্যরিস্টার আমীর-উল ইসলাম বলেন, তারা শপথ গ্রহণ করেছিলেন কৃষক, শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের নামে, এই শপথের প্রতিফলন ঘটেছিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে মূল তিনটি বিষয় সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানুষের মানবিক মর্যাদা সাধারণ মানুষের কাছে করা সত্তরের নির্বাচনী অঙ্গিকারেরই বাস্তবরূপ। তিনি মনে করেন, এই শপথ এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জানা দরকার এবং এ বিষয়ে তাদের গবেষণা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী এমপি সত্তরের নির্বাচনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, সে সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব উন্নত ছিল না, তা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ প্রতিটি অঞ্চলের জনগণের কাছে পৌঁছেছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করেছিল। তিনি বলেন, যে আদর্শ এবং দর্শন নিয়ে এই নির্বাচন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা তা স্মরণ রাখতে হবে। সিমিন হোসেন রিমি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিচক্ষণ এবং গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষ, তার নেতৃত্বে আদর্শচ্যুতি ছিল না, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক সরকার তাদের শপথ গ্রহণ করাবে না, তাই তিনি জনগণের কাছে শপথ গ্রহণ করে সত্তরের নিবার্চিত এমপি এমএলএদের বৈধতা নেন, এই বৈধতার কারণে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার গঠন সম্ভব হয়েছিল। পাশাপাশি তিনি নেতাকর্মী এবং জনগণকে প্রস্তুত রাখছিলেন স্বাধীনতার জন্য। আর শপথটি বিশ্লেষণেও দেখা যাবে এই শপথে তিনি জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নের কথা বলেছিলেন, জনগণকে সাথে নিয়ে চলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে গীতাঞ্জলি একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর শিল্পীদের গণসঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। ৩ জানুয়ারি ১৯৭১-এর শপথ অনুষ্ঠান শেষ হয়েছিল প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী জাহিদুর রহিমের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানের মধ্য দিয়ে, পরবর্তীতে যে গান স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ঘোষিত হয়। ৩ জানুয়ারি ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত অনুষ্ঠানটিও শেষ হয় শিল্পীদের কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বিশেষ প্রদর্শনী

১ম পৃষ্ঠার পর

মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ ছিলো। মুক্তিযুদ্ধে সাংবাদিকদের গৌরবজ্জল ভূমিকা স্মরণ করে মতিয়া চৌধুরী বলেন; সাংবাদিকদের সাহসী ও বলিষ্ঠ অবস্থানের কারণে পঞ্চাশ বছর পরেও মুক্তিযুদ্ধের তথ্য ও আলোকচিত্র আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে আছে। ইন্টারনেটের আর্বিভাবের ফলে সাংবাদিকতা যেমন সহজ হয়েছে তেমনি চ্যালেঞ্জও বেড়েছে। সাংবাদিকতা বাণিজ্যিক রূপ নিয়েছে। তরুণরা পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা বেছে নেওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে মতিয়া চৌধুরী বলেন, আমি খুশী হই যখন দেখি তরুণরা জীবিকা অবলম্বনের পথ হিসেবে সাংবাদিকতা বেছে নিচ্ছে। সাংবাদিকরা পেটে পাথর বেঁধে সাংবাদিকতা করবেন সেই দিন আর নাই। আমাদের সাংবাদিকতা যাতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পৌঁছতে পারে সে ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

স্বাগত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারোয়ার আলী বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য যিনি দেশকে প্রস্তুত করেছেন ২৫ মার্চ রাতে পাক হানাদার বাহিনী তাঁকে আটক করে পাকিস্তানে বন্দি করে নিয়ে যায়। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন ছাড়া স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করেনি। বঙ্গবন্ধু বার বার বলেছেন সেলের পাশে তাঁর জন্য কবর খোঁড়া হচ্ছে, ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত। তিনি মৃত্যুর জন্য সবসময় তৈরি ছিলেন। একজন ফাঁসির আসামীর যে চারিত্রিক দৃঢ়তা সেটা অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং অনেকের জন্য অনুকরণীয়।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ত্বরান্বিত করতে সে সময় যুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার, ভারত সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চাপ প্রয়োগ করেছিল। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে সকলের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ডা. সারোয়ার আলী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারোয়ার আলী ছাড়াও, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আজীবন সদস্য ডা: লতিফা সামসুদ্দীন, অধ্যাপক হাফিজা খাতুন এবং জাদুঘরের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি মতিয়া চৌধুরী এমপি ফিতা কেটে এবং জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু লিখে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পরে তিনি আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন।

বিশেষ এ প্রদর্শনীতে পঞ্চাশ বছর পর বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যেন ছবির ক্যানভাসে আবারো সজীব হয়ে উঠেছে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর আটক, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবর, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে বিশ্ববাসীর তৎপরতা এবং প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত তথ্যাবলী এ প্রদর্শনীতে ঠাঁই পেয়েছে।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ দেশ স্বাধীন হলে; পাকিস্তানি বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ লন্ডনে পৌঁছান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি। ওইদিন বিকেল ৫টায় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ -এর আমন্ত্রণে এক বৈঠকে মিলিত হন বঙ্গবন্ধু। নিজ হাতে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধুকে বিরল সম্মান জানান। সে সময়ে এ ঘটনা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গুরত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। ৯ জানুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ভারতে যাত্রা বিরতী শেষে ১০ জানুয়ারি বিজয়ীর বেশে স্বপ্নের সোনার বাংলায় পা রাখেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এ দেশ ও দেশের মানুষকে এক নজর দেখতে মুখিয়ে ছিলেন তিনি। তাইতো লন্ডনে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন " Can't wait to a moment to return to my people"।

প্রিয় নেতাকে কাছে পেয়ে উদ্বেলিত ছিলো বাংলার মানুষ। লাখো জনতার মহাসমুদ্র সেদিন স্বাগত জানিয়েছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তেজগাঁও বিমান বন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান ছিলো লোকে লোকারণ্য। বাহারী শিরোনাম আর বিশেষ ক্রোড়পত্র ও বিজ্ঞাপনে সংবাদপত্রগুলো ইতিহাসের মহানায়ককে সেদিন স্বাগত জানিয়েছিলো। সে সময়কার আলোকচিত্র ও সংবাদপত্রের ক্লিপিংস প্রদর্শিত হচ্ছে বিশেষ এ প্রদর্শনীতে।

আর্কাইভ ও ডিসপ্লে টিম

অতীতের পাতা থেকে : নভেম্বর ১৯৯৫

বীরত্ব ও বেদনামণ্ডিত সীমান্ত ভূখণ্ড : তেলিখালি

মফিদুল হক, *ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*

ময়মনসিংহ থেকে হালুয়াঘাট যাওয়ার রাস্তা এখন হয়ে উঠেছে সুগম্য ও সুন্দর। শম্ভুগঞ্জে ব্রহ্মপুত্রের ওপর গণচীন সরকারের আনুকূল্যে মৈত্রী সেতু তৈরি হওয়াতে ফেরি পারাপারের দুর্ভোগ ঘুচেছে। ওপারে সদ্যনির্মিত পিচঢালা রাস্তা ঝকঝক করছে, যেন বুক পেতে আহ্বান জানাচ্ছে যানবাহনদের। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার সংখ্যা অবশ্য কম। বসতিও তেমন ঘন নয়। তড়তড়িয়ে এগিয়ে চলে গাড়ি। হালুয়াঘাট পার হয়ে আমরা প্রথমে নামলাম মোরাম করা রাস্তায়, পরে একেবারেই কাঁচা পথ। কিছুটা এবড়ো-খেবড়োও বটে। সীমান্ত এলাকাগুলোতে নতুন ধাঁচের যেসব বাণিজ্য শুরু হয়েছে তার চিহ্ন এখানে আছে। সারি সারি কয়লার ভাণ্ডার পার হয়ে আমাদের এগোতে হয় তেলিখালির দিকে। এইসব কয়লা ভাণ্ডার পার হয়ে থামতে হয় একটি খাতের কাছে। রাস্তায় কালভার্টের কোন চিহ্ন নেই। নিচের খাতে অল্প অল্প পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে। গাড়ি নিয়ে আর এগোনো সম্ভব নয়। এবার তাই পায়ে হেঁটে এগোতে হয়। পথ অবশ্য খুব বেশি নয়-এক মাইলের কিছু কম হবে। দূর থেকে চোখে পড়ছিল বাজারে মানুষের ভিড়। খড়বড়ে একটি গেট বানানো হয়েছে, টানানো আছে রঙিন চাঁদোয়া। আর সার বেধে দাঁড়িয়ে আছে স্কুলের কিছু বালক-বালিকা, ডিসি সাহেবের অপেক্ষায়। রোদে ঘর্মাক্ত তাদের চেহারা, কিন্তু চোখে-মুখে কৌতুহলের অন্ত নেই। ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে আরো কিছু লোক। মাইক পরীক্ষা চলছে সরবে। এখন নভেম্বরের শুরু, কিন্তু শীতের কোন লক্ষণ নেই। বেলা না চড়তেই রোদ হয়ে উঠেছে কড়া। বাজারে বৃক্ষ বিশেষ নেই। ফলে রোদের তাপ থেকে বাঁচারও কোন উপায় নেই। এমন একটি সময়েই ট্রাস্ট সদস্য আক্কু চৌধুরী ও আমি এসে পৌঁছলাম তেলিয়াখালিতে। আমাদের উদ্দিষ্ট বাজারের পেছনের বিডিআর-এর সীমান্ত ফাঁড়ি এবং বাজারে আয়োজিত সভা।

২ নভেম্বর রাতে তেলিখালি ক্যাম্পের ওপর পরিচালিত হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক অভিযান। প্রায় তিন শতাধিক পাকসেনা ও তাদের সহযোগীরা ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল এই সীমান্ত ঘেঁষা ফাঁড়িতে। নির্মাণ করেছিল শক্ত বাঙ্কার, ভারি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদে তারা ছিল শক্তিমান। জেনারেল নিয়াজিও একবার এসে দেখে গিয়েছিলেন এই ঘাঁটির প্রতিরোধ ব্যবস্থা। কিন্তু জানপ্রাণ দিয়ে লড়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। পেছন থেকে ভারতীয় বাহিনী ভারি গোলার সমর্থন যোগালেও লড়াইটা করেছিল মুক্তিবাহিনীর সদস্যরাই। অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে তাঁরা মুক্ত করেন তেলিখালি, পাকবাহিনীর দুর্ভেদ্য এক ঘাঁটির ওপর বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দেন বাংলার দামাল ছেলেরা। জীবনপণ এই লড়াইয়ে শাহাদাৎ বরণ করেন ২৮ জন বীর যোদ্ধা। যুদ্ধের সেই তীব্রতার মধ্যে মর্টারে শত্রুর অবিরাম গোলাবর্ষণের জন্য শহিদদের যথাযোগ্য সমাধির ব্যবস্থাও করা যায়নি। পাকবাহিনীর খোঁড়া একটি ট্রেঞ্চে একত্রে এই ২৮ জন বীর শহীদের গণকবরের ব্যবস্থা করা হয়। পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে মাত্র সাতজনের। এঁরা হলেন– শওকত আলী, আক্তার হোসেন সরকার, হযরত আলী, আলাউদ্দিন, শাহজাহান, রঞ্জিত গুপ্ত ও সিপাহী ওয়াজিউল্লাহ। বাকি ২১ জনই অজ্ঞাতনামা শহিদ, জড়াজড়ি করে শুয়ে আছেন তেলিখালির মাটিতে তাঁদেরই সাথী যোদ্ধাদের সঙ্গে।

বাজারের পেছনে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি ঝরনা। গভীর খাত ইঙ্গিত দেয় বর্ষায় কেমন ফুঁসে ওঠে এর জল। এখন পার হতে গেলে হাঁটু অবধিও ভেজে না। কলকল করতে করতে ঝরনা পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বালক-বালিকার দল। আমরাও যাই বিডিআর ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে পেছনের গণকবরের কাছে। সিমেন্ট বাঁধানো শক্ত বাংকারের পাশে এসে দাঁড়াই আমরা। আক্কু চৌধুরীর হাতে ফুলের স্তবক। কোথায় গণকবর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তা জানতে চাইলে সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধা বলেন, এই গাছের নিচেই ছিল ট্রেঞ্চ, সেখানেই সবাইকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। ফাঁড়ির সীমানার ঢালে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আক্কু চৌধুরী গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসান পুষ্পস্তবক। ২৮ জন যোদ্ধা একত্রে শুয়ে আছেন। কোনো চিহ্ন নেই, কোনো সমাধি-ফলক নেই, কোনো স্মৃতিস্মারক নেই, এমন কি মাটি উঁচু করা কোনো কবরের আভাসও নেই। দেশের মানুষ কিছুই জানে না দেশমাতৃকার বন্দিত্ব মোচনে জীবনদানকারী বীরদের কথা। এই কথা জানে কেবল তেলিখালির মাটি, জানে বাতাসে মর্মরিত গাছের পাতা, জানে ঝরনার নিত্যপ্রবাহিত জলধারা, আর জানে তেলিখালি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধারা, বিজয়ের পর যুথবদ্ধতা ভেঙ্গে যাঁরা ছত্রখান হয়ে পড়েছিলেন, জীবনের ঘূর্ণিস্রোতের টানে ছিটকে পড়েছিলেন চারদিকে। কিন্তু তেলিখালির স্মৃতি তাঁরা কি করে ভুলবেন?

সেই মানুষেরাই আবার সংগঠিত হতে শুরু করেছেন। বছর দুয়েক আগে প্রথম তাঁরা উদ্যোগ নেন একটা বাজার প্রতিষ্ঠার, লক্ষ্য ছিল বাজার গড়ে উঠলে এখানে লোকজনের নিত্যকার যাতায়াত গড়ে উঠবে। ফলে শহিদসমাধি লোকচক্ষুর আড়াল থেকে চলে আসবে লোকজনের সামনে। বাজারের জন্য জমি দিলেন এক গারো পরিবার। নতুন গড়ে ওঠা বাজার বলেই গাছপালার আচ্ছাদন বিশেষ নেই। দু'চারটি মনোহারী দোকান। বড় বড় টানা বেঞ্চের গুটিকয় চাখানা। এই নিয়েই বাজার। বাজারের মুখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শহিদদের স্মরণে স্মৃতিফলক, প্রতি বৎসর এখানে নিয়মিতভাবে আয়োজিত হয় স্মরণ-অনুষ্ঠান। আমরা এসেছি এমনি এক স্মরণানুষ্ঠানে।

নিস্তরঙ্গ গ্রামের ভিতর দিয়ে আমরা ফিরছিলাম নিঃশব্দে। কী আশ্চর্যরকম শান্ত এই গ্রাম! লোকজনের দেখা বিশেষ মেলে না। এমন কি পুকুরের জলেও যেন কোনো দোলা নেই ঢেউয়ের। অল্প বাতাসে নড়ছে কচি ধানের ডগা। ধানখেতের পেছনে পাহাড়ের সারি। এই পাহাড় থেকে ভারত ভূখণ্ডের সীমানা শুরু। ছোট ছোট টিলাগুলো মিলেছে দূরের গারো পর্বতমালার সঙ্গে। পাহাড় ও সমতল যেন মিলনের মুগ্ধতায় থির হয়ে আছে। প্রকৃতির এমন সুষমাময়ী রূপ দেখে মনে হয় কী নিবিড় প্রশান্তি আমাদের চারপাশ জুড়ে। এই প্রকৃতির সঙ্গেই মিশে আছেন বাংলার শহিদেরা, কোনো ফরিয়াদ তাঁদের নেই, নেই কোনো অভিযোগ।

এক বিষণ্নতা আঁকড়ে ধরেছিল আমাদের সবাইকে। কত শত মানুষ দেশের প্রতি দেশবাসীর প্রতি কী অপরিসীম দরদ নিয়ে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে দিয়েছিলেন। সভামঞ্চে এক যুবক আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন কামালপুরের যুদ্ধে শহীদ জালালের পিতার সঙ্গে। জানালেন বড়ই দুঃস্থ অবস্থা তাঁর, এখন ভিক্ষে করেই চলেন বলা যায়। বৃদ্ধের পরনে তিল পড়া জীর্ণ এক জামা। বোঝা যায় এটা তাঁর একমাত্র ভদ্র পোশাক, দেখে মনে হয় আর একদিন পরলেই বুঝি ঝুরঝুর করে শতখান হয়ে যাবে। পা তাঁর ফুলে আছে অসুস্থতার কারণে। চোখের দৃষ্টি বিহ্বল, যেন চারপাশে এতো আলোড়নের কিছুই দেখছেন না তিনি। হাতে হাত নিয়ে আমি বোকা হয়ে রইলাম। আমার মনে পড়ছিল মাত্র ক'দিন আগে পড়া ইপিআর-এর তরুণ প্লাটুন কম্যান্ডার শহীদ সিরাজুল ইসলামের শেষ পত্রের কথা। ৮ আগস্ট ১৯৭১ জামালগঞ্জ অপারেশনে তিনি শহিদ হন। ৩০ জুলাই শেষ পত্রে নিজ গ্রামে বাবাকে লিখেছিলেন : ''মৃত্যুর মুখে আছি। যে-কোন সময়ে মৃত্যু হইতে পারে এবং মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত। দোওয়া করিবেন মৃত্যু হইলেও যেন দেশ স্বাধীন হয়। তখন দেখবেন লাখ লাখ ছেলে বাংলার বুকে পুত্রহারাকে বাবা বলে ডাকবে। এই ডাকের অপেক্ষায় থাকুন।''

কে জানে কবে জেগে উঠবে সেই ডাক, আর কতকাল চলবে সেই অপেক্ষা?

(মুক্তিবার্তা, প্রথম বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর-১৯৯৫)

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রয়াত কর্মী রনজিত কুমার প্রতিটি জেলায় ভ্রমণ শেষে দাপ্তরিক প্রতিবেদন পেশ করতেন। তাঁর এই প্রতিবেদন নেহায়েত কর্ম প্রতিবেদন হতো না। প্রতিটি জেলার প্রতিবেদন পাঠে সেই জেলার সমাজ সংস্কৃতিসহ পূর্ণাঙ্গ চিত্র যেমন পাওয়া যেত, তেমন রনজিত কুমারের সাহিত্যিক সত্তার পরিচয় ফুটে উঠতো। ২ জানুয়ারি ২০২২ ছিল রনজিত কুমারের ৩য় প্রয়াণ দিবস। তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ২০০৫ সালে মৌলভীবাজার পরিভ্রমণ করে তিনি যে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন তার নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো–

মৌলভীবাজার জেলায় 'শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং মানবাধিকার ও শান্তি-সম্প্রীতির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধকরণ' প্রকল্পের কাজের রিপোর্ট

গত ১৭ জুলাই দুপুর বারোটায় অফিস থেকে 'ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' গাড়িটি নিয়ে আমরা পাঁচজন মৌলভীবাজার অভিমুখে রওয়ানা হই। মৌলভীবাজারের সার্কিট হাউজে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করি। ১৮ জুলাই কমলগঞ্জ উপজেলার মণিপুরী আদিবাসী অধ্যুষিত 'তেতইগাঁও রসিদউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়'-এ প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের মৌলভীবাজার জেলার প্রোগ্রাম শুরু হয়। বৃষ্টিবিঘ্নিত পরিবেশে প্রথম দিনের প্রোগ্রাম শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রোগ্রামে তেমনভাবে বৃষ্টির সম্মুখীন আমরা হইনি। আর প্রথম দিনের প্রোগ্রামে ঢাকা থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, ট্রাস্টি রবিউল হুসাইন, কথাসাহিত্যিক রশীদ হায়দার এবং শিল্পী হাসান আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে প্রচুর কৌতুহল দেখে ভীষণভাবে আশাবাদী হন। পরবর্তীতে ১ আগস্ট কথাসাহিত্যিক রশীদ হায়দার এ বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া 'দৈনিক আমার দেশ' প্রত্রিকায় একটি প্রতিবেদন আকারে লিখেন। তবে এবারে শুক্রবারে প্রোগ্রাম করার ব্যাপারে কোনো আগ্রহী প্রতিষ্ঠান পাওয়া যায়নি। শুক্রবার দিনগুলো আমরা গাড়ি ধোয়া-মোছার কাজ সারি। এবারে তেমন আগ্রহ না থাকার কারণে কোনো 'পাবলিক শো' অনুষ্ঠিত করতে পারিনি।

মৌলভীবাজার জেলায় নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল জিনিসের দাম খুব বেশি। সাধারণত 'লন্ডনি' লোকের প্রভাবে এটা হতে পারে। খাবার-দাবারের দামও বেশি। এখানে সবগুলো উপজেলায়ই বেশ কয়েকটি করে চা-বাগান রয়েছে। চা-বাগানে চা-শ্রমিকদের ঘিরে এখানে অন্যরকম একটি জীবন-প্রবাহ রয়েছে। এখানে সাংস্কৃতিক তৎপরতা খুব কম। নাট্য সংগঠন মাত্র একটি। অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের উপস্থিতিও তেমন নজরে পড়লো না। তবে এর মধ্যেই এখানকার সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট-কে দেখলাম দু'ভাগে বিভক্ত। তবে, কিছুদিনের মধ্যেই জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিলেট বিভাগীয় সাংস্কৃতিক জোটের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে দু'গ্রুপই একসাথে কাজ করতে আগ্রহ দেখিয়েছে।

এখান থেকে বর্তমানে বেশক'টি লিটল ম্যাগাজিন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, যা খুব আশার খবর।

একটি জেলায় যখন আমরা ক্রমান্বয়ে প্রতিদিন প্রোগ্রাম করতে থাকি, তখন 'ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর'টিকে প্রায়ই একই রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করতে দেখে অনেক লোকই রাস্তার মধ্যেই এটি দেখার জন্য প্রবল আগ্রহ ব্যক্ত করে। তখন তাদের অনেককেই বিভিন্ন কারণে নিরাশ করতে হয়। এভাবে অনেক স্কুল/কলেজকেও নিরাশ করতে হয়। যাহোক, এভাবে চলাচলের কারণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রচারের কাজটা বেশ ভালোভাবেই হয়ে যায়। এবারে, এভাবে প্রচারের এক পর্যায়ে গত ১৩ আগস্ট মৌলভীবাজার সদরে 'টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ'-এর অধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এ.কে.এম. রফিকুল আমিন মহোদয় জেলা প্রশাসকের অফিসে যোগাযোগ করে অবশেষে হোটেলে আমাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে প্রোগ্রাম আদায় করে নিতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে তার ওখানে প্রোগ্রাম করে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি।

যাহোক, আমাদের প্রোগ্রাম নির্বিঘ্নে চলছে। কোথাও আমাদের প্রোগ্রাম করতে দেবে না বা দেয়নি– এরকমটা এখনও হয়নি। কাজেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার এ প্রকল্প নিয়ে বেশ আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারে।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেল যে, আমরা এতবড় গাড়ি নিয়ে প্রতিটি জেলার সদর থেকে উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল/কলেজেও যেতে পারছি। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে, এটা তারই পরিচায়ক। এছাড়া, এখন প্রতিটি স্কুল/কলেজেই যোগাযোগের জন্য শিক্ষকদের মোবাইল ফোন নম্বর পাওয়া যাচ্ছে, যেটা এক বছর পূর্বে পঞ্চগড় জেলায় পাওয়া যায়নি। এতে করে বোঝা যাচ্ছে যে, দ্রুত মোবাইল ফোনের আওতায় চলে আসছে সারাদেশ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষকগণও দ্রুতই সংগ্রহ করে নিচ্ছে মোবাইল ফোন। গ্রামীণ মধ্যবিত্তের যে দ্রুত বিকাশ হচ্ছে, এটা তারও পরিচায়ক।

রিপোর্টদাতা–**রনজিত কুমার**
তারিখ : ২৪.০৮.২০০৫ *প্রকল্প সমন্বয়কারী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official